দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 13 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ......

সত্যের কাছে হার মানা

রণজিৎ বিশ্বাস

স্কুলে-কলেজে সব পরীক্ষা দিয়েছি– দশটা থেকে বারোটা। এইটি যে অন্যরকম হবে, নজর না করে নিজের ভবিষ্যতের দ্বাদশঘটিকা বাজিয়ে ফেলেছিলাম। সে এক গল্পের মতো ঘটনা। মন বলে– এমন ঘটনা আর কোথাও কেউ ঘটিয়েছে কিনা গবেষণা করে বের করতে হবে

শিক্ষক শুধু আমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই পাই না, পাই অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবেও, অনানুষ্ঠানিকভাবেও। আমি তাদের ডাকি 'ভাবশিক্ষক'। ভাবনায় যাকে ঠাঁই দিয়েছি শিক্ষক হিসেবে, তিনি তো হতেই পারেন আমার ভাবশিক্ষক।

এমন শিক্ষক আমার ভাগ্যে বড় বেশি মিলেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকও কখনো কখনো হয়ে গেছেন একই সঙ্গে ক্লাসরুম-টিচার ও ভাবশিক্ষক। ক্লাসরুমে বসে হয়তো তার কাছে শিখেছি চার্লস ল'-বয়েলস ল', আর তার বাইরে নিজের চলন-বলন-কথন ও আচরণ থেকে তিনি দিয়েছেন জীবনের শিক্ষা।

চিটাগাং কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় (১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত দেশের অন্যতম প্রাচীন সরকারি কলেজ) কেমিস্ট্রি বিভাগের এক শিক্ষক দুটি সাংঘাতিক বাক্য মনের পলিতে পুঁতে দিয়েছিলেন। চুয়াল্লিশ বছরেও তা স্মৃতিছুট হওয়া যাচ্ছে না, হতে চাচ্ছিও না।

চট্টগ্রামের লোক; সবার বেলায় নয়, কারো কারো বেলায়; মুখ খুললেই বোঝা যায় তার বাড়ি চট্টলায়; প্রশ্ন রাউজান না রাঙ্গুনিয়া, প্রশ্ন পটিয়া না চকোরিয়া। এই বাংলাকে আমরা যেন 'চিংলা' (চিটাগাং+বাংলা) ও ইংলিশকে 'চিংলিশ' (চিটাগাং+ইংলিশ) বলি, সে চেষ্টা আমি চালিয়েছিলাম। মোটামুটি প্রচারও করেছিলাম। হালে পানি তেমন মেলেনি। কারণ ঠগ বাছতে গিয়ে গা-উজাড় হয়ে যাচ্ছিল। নিজেও সে দলে পড়ে যাচ্ছিলাম।

এ সমস্যায় চট্টগ্রামের নিকটাত্মীয় সিলেট। একই ফর্মুলায় শ্রীহট্টভূমের বাংলা ও ইংরেজির নাম খোয়ানো যেতে পারে 'সিংলা' (সিলেট+বাংলা) ও 'সিংলিশ' (সিলেট+ইংলিশ) বা 'সিংরেজি' (সিলেট+ইংরেজি)।

আমাদের সেই স্যার, কেমিস্ট্রির সিরাজুল ইসলাম স্যার, তার আধা-চিংলা উচ্চারণে দুটি মহাবাক্য দিয়েছিলেন। এক. লেবার নেভার গৌজ আনপ্রাইজড (শ্রম কখনো পুরস্কার বিনে যায় না), দুই চান্স ফেইভারস দ্য রেডি মাইণ্ড (সুযোগ উন্মুখ মনের সহায়ক)। তার গোত্রের জ্ঞানপিতাদের কাছ থেকেই পাতাকুড়োনির ছেলের মতো আরও কিছু সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু কোনো কিছুই কাজে লাগাতে পারিনি।

লাগানো উচিত ছিল, কিন্তু না লাগাতে পারা অথবা লাগাতে গিয়ে সাফল্যের সঙ্গে ব্যর্থ হওয়া বাক্য দুটির একটি হচ্ছে– ডোনট পুট অব টিল টুমরো হোয়াট য়্যু ক্যান ডু টু-ডে (আজ যা করে ফেলতে পারো, আগামীকালের জন্য তা তুলে রেখো না।), অন্যটি ফরচুন স্মাইলস অন ব্রেইভ (সাহসীকেই সাফল্য দেয় সহাস্য সঙ্গ)। দ্বিতীয় বাক্যটি অনুসরণ করতে গিয়ে দুবার মনে রাখার মতো কাণ্ড ঘটিয়েছি। অবিশ্বাস্যও।

প্রথমবার প্রতিযোগিতামূলক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে ঢোকার সময়। প্রথম নিশ্চিত আয়ের ও সম্মানজনক অবস্থানের চাকরি। প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্রজীবন শেষ করার আগেই পেয়ে যাওয়া।

চট্টগ্রাম কলেজে অনার্স পড়ার সময় বহুবার ঠিক করেছি, সাবজেক্টটা পাল্টাতে হবে। যা পড়ছি, তাতে আনন্দ পাচ্ছি না। দু-তিনটে কারণ। প্রথমত, সময় ও মন কোনোটাই লাগাতে পারছি না। পার্টটাইম চাকরি, দিনে দু-চারটে টিউশনি তারপর নিজে রেঁধে-বেড়ে খাওয়া– এতসব করে লেখাপড়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, আমার তো স্বপ্ন ভালো রেজাল্ট করার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার। কিন্তু যেভাবে চলছি, তা দিয়ে তো কিছুই করা যাবে না। অত জায়গায় সময় দিয়ে পাস করে হয়তো বেরিয়ে আসা যাবে কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে, সেটি গাছের মগডালে বসে আমার দিকে তাকাবে, করুণার হাসি হাসবে আর মিনিটে একশ' তিনবার আমাকে 'বেচারা' ডাকবে।

তৃতীয়ত, যারা ভালো রেজাল্ট করার সম্ভাবনা জাগাচ্ছে, আমি তাদের চেয়ে অশক্ত ও নিম্নমানের ছাত্র নই। অথচ নোটের জন্য, বইয়ের জন্য তাদের কাছে সহায়-সম্বলহীনভাবে আমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে।

অতএব কী করতে হবে? মনের এক কোণে বড় শক্ত এক জবাব এগিয়ে ছিল, দ্ব্যর্থহীন– খুব তাড়াতাড়ি ডিপার্টমেন্ট পাল্টানোর চেষ্টা করো। খুব তাড়াতাড়ি। পরে আর সময়ই পাবে না। এখনো পাও কিনা সন্দেহ। কোন ডিপার্টমেন্টে যাওয়ার চেষ্টা করব! মনের সঙ্গে তখন আমার কড়ার শুরু হলো।

: বিজ্ঞানে তোমার প্রিয় বিষয় কেমিস্ট্রি। অ্যাডমিশন টেস্টে ভালোই উতরোলে, কিন্তু ঝুঁকি নিয়ে অপেক্ষা করতে পারলে না। নিয়মের প্যাঁচে শেষ পর্যন্ত আমছালা দুই-ই যাবে ভয়ে একটায় ভর্তি হয়ে গেলে। এখন বোঝো ঠ্যালা, বোঝো হ্যাপা।

: নুনের ছিটে কাটা ঘায়ে পেতে আর ভালো লাগছে না। গঠনমূলক পরামর্শ দাও! কী করতে হবে, তাই বলো।

মন বলল, প্রিয় দুটো বিষয় আছে তোমার। বাংলা আর ইংরেজি। ওখানে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ, বাধ্যতামূলক শিক্ষা সফর আর হার্বেরিয়াম শিট বানানোর ঝামেলা নেই। সময়ও তুমি অনেক কম দিয়ে পারবে। ট্রাই করো। হয় বাংলা, নয় ইংলিশ।

মনকে বললাম– ঠিক আছে। তোমার কথা মানলাম। প্রথমে বাংলা। কিন্তু, শুভানুধ্যায়ীজনের একজন বললেন, লেজ সোজা হয়ে গেছে (আমাদের খুব পরিচিত বিশ্বস্ত ও গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণীর বাঁকানো লেজ যদি সোজা হয়ে যায়, সেটি নাকি পাগল হয়ে যায়)? নাকি সেই সর্বভুক প্রাণীর (পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়!) গ্রুপে নাম লিখিয়েছিস?!

: কেন! এমন কথা কেন শুনতে হচ্ছে আমাকে!

: হচ্ছে, কারণ তোর মস্তিষ্কের কলকব্জা নড়ে গেছে। বাংলা তোকে কেন পড়তে হবে?

: সাবজেক্টটায় আমার ইন্টারেস্ট আছে।

: ইন্টারেস্ট যখন আছে, তার জোরে ওটা শিখে ফেলতে পারবি। 'রোলিং স্টোন' হোসনে। যেখানে আছিস, সেখানে থাক; যা পড়ছিস, পড়।

না, মানিনি। তার কথা না মেনেই একদিন মমতাজ স্যারের সঙ্গে কথা বলার জন্য অনেক সাহস সঞ্চয় করলাম। নাটকের মানুষ, সাহিত্যের মানুষ এবং খুব জনপ্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ আমার ক্লাসরুম টিচার। তখন ১৯৭৪-৭৫'-এ চট্টগ্রাম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান, সহযোগী অধ্যাপক।

ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের প্রথম দিনটি থেকেই তিনি আমাদের অনেকের হৃৎমন্দিরের বিগ্রহ হয়ে বসে আছেন। প্রতি সোমবারের ফোর্থ পিরিয়ড কোনো সপ্তাহে দু-তিনবার আসে না– বড় অস্থিরতায় প্রশ্ন করতাম। দিনটির জন্য বড় ব্যগ্রতায় অপেক্ষা করতাম।

একদিন তার পিছু পিছু হাঁটছিলাম। ভয়ে ভয়ে। আমাকে আলাদা করে চেনার কারণ নেই, হাঁটতে হাঁটতেই, মাটি থেকে দৃষ্টি না তুলেও পেছনের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন–

: কিছু বলবে?

: স্যার, আমি ডিপার্টমেন্ট পাল্টাতে চাই।

: এখন কোন ডিপার্টমেন্টে আছো?

: বটনি।

: পাল্টাতে চাও কেন?

: বটনি আমার ভালো লাগছে না।

: কাল যদি বাংলা তোমার ভালো না লাগে!

আমি এ প্রশ্নের কোনো উত্তর, ওই বয়সে, আমার ব্রেইন-বক্স'-এর কোনো জায়গায় খুঁজে পাইনি। আমি থেমে পড়লাম, স্যার এগিয়ে গেলেন। আর একটা জিনিস আমার গোবর্জভরা মাথা থেকে মোটা ঘাড়টা বেয়ে চিরদিনের জন্য নেমে গেল। ডিপার্টমেন্ট পাল্টানোর ভূত।

আনন্দ না পাওয়ার পরও প্রতিদিন কয়েক প্রকার ঐচ্ছিক কিংবা অনৈচ্ছিক গোলামির জন্য পড়ার সময় জোটাতে না পারার পরও এবং জনাদেড়েক ছাড়া প্রায় সব শিক্ষকের জ্ঞানদানের ভঙ্গি অনাকর্ষণীয় হওয়ার পরও বটনি, চিংলার জোরে কেউ কেউ বলত 'ভোটানি', নিয়েই এগোতে থাকলাম।

তখন থেকে মাথায় ঢুকল, রেজাল্ট যখন স্বপ্নের পেশা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে ঢুকতে দেবে না, জেনারালিস্ট'র এই চাকরিটা পাওয়ার চেষ্টা করি। বোধহয় পারব।

পারলাম। তবে, ঘাটে ঘাটে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটিয়ে। এবং ক্লাসে আরও কারো মাথায় এই ভাবনাটি ঢোকার ও বসার জায়গা পেল না।

তখনো অনার্স পাস করা হয়নি, পরীক্ষাটা দেওয়া হয়েছে শুধু। কাজটা হয়ে যাবে বলেই হয়তো হাতের কাছে নিয়মের একটা সমর্থন পাওয়া গেল। পরীক্ষায় বসা হয়েছে ও পাস করার সম্ভাবনা আছে– এই সার্টিফিকেট নিয়ে পরীক্ষা দেওয়া যাবে।

কলেজ সে সার্টিফিকেট দিল, সাহস করে ফরমফিলাপ করলাম, অ্যাডমিট কার্ড পেয়ে গেলাম এবং পরীক্ষায় বসে গেলাম। ষোলশ' নম্বরের পরীক্ষা। প্রতি পেপারে পাস নম্বর শতকরা পঞ্চাশ। পরীক্ষার নাম সুপিরিয়র পদে নিয়োগ পরীক্ষা ১৯৭৯।

নৈর্বাচনিক বিষয় রাখলাম– উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ও কৃষিবিজ্ঞান। কৃষিবিজ্ঞান কোনোদিন না পড়েও তাকে সঙ্গে রাখার কারণ, লেখাপড়ার জোরপুঁজি তো এমনিতে কিছু নেই, সিলেবাস দেখে মনে হচ্ছে– উদ্ভিদ' বিজ্ঞানের কিছু জ্ঞান এখানে কাজে লাগানো যাবে, কোন কোন বিষয়ে-চ্যাপারে পোকায় খাওয়া দাঁতগুলো বসানো যাবে। বসাতে পেরেছিলামও।

অ্যাডমিট কার্ড পরীক্ষার বেশ আগেই হাতে পেয়েছিলাম, কিন্তু একবারের জন্যও খেয়াল করিনি, সকালবেলার পরীক্ষার সময় নয়টা থেকে বারোটা। অথচ কতবার কার্ডটা উল্টেছি-পাল্টেছি, নিয়ম পড়েছি, মানুষকে দেখিয়েছি!

স্কুলে-কলেজে সব পরীক্ষা দিয়েছি– দশটা থেকে বারোটা। এইটি যে অন্যরকম হবে, নজর না করে নিজের ভবিষ্যতের দ্বাদশঘটিকা বাজিয়ে ফেলেছিলাম।

সে এক গল্পের মতো ঘটনা। মন বলে– এমন ঘটনা আর কোথাও কেউ ঘটিয়েছে কিনা গবেষণা করে বের করতে হবে।

চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে সরকারি কমার্স কলেজ। আমি পত্রিকায় কাজ করার সূত্রে যাদের বাড়ির এক কোনায় মাথা গুঁজি সেটি কাজির দেউড়ি, স্টেডিয়াম ও সার্কিট হাউসের কাছে।

ঠিক করলাম সাড়ে ৯টায় বেরোবো, সব সময় হেঁটে হেঁটে কাজ সারলেও কিংবা বাসের খোপে দাঁড়িয়ে বসে আজ যাব রিকশায় চেপে, 'রাজাবাদশাহ'র মতো। আধা ঘণ্টা সময় যথেষ্ট!

বাংলা প্রথমপত্রের পরীক্ষা। একটি রচনা লিখতে হবে, তার জন্যই একশ' নম্বর। নয়টা থেকে, যখন পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে, শহরের আরেক কোনায়, অনেক দূরে, তখন আমি একটা বাড়ির বারান্দায় পায়চারি করছি আর ভাবছি– কোনো রচনা লিখতে হলে কী লিখব, কোথায় কোন কোটেশন কাজে লাগাব, কোন প্রসঙ্গ কোথায় টেনে নেবো। হাজার হোক, একটি মাত্র রচনা, তার জন্যই একশ' নম্বর, এবং তাতে কমপক্ষে পঞ্চাশ নম্বর জুটিয়ে পরীক্ষার বৈতরণী পার হতে হবে।

সাড়ে ন'টাতেই রিকশায় উঠলাম। কাজির দেউড়ি সেকেন্ড লেইন (এখনকার সাহিত্যিক মাহবুব উল আলম সড়ক) টু কমার্স কলেজ আগ্রাবাদ। জীবনের সবচেয়ে লম্বা ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার প্রথম বিষয়ের তিরিশ মিনিট শেষ। আরও তিরিশ মিনিটে আমার পৌঁছা সম্ভব কিনা সন্দেহ।

হ্যাঁ, সত্য এবং সত্য কখনো কখনো বানিয়ে বলা গল্পকেও পেছনের বেঞ্চিতে পাঠিয়ে দেয়। 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেইঞ্জার দ্যান ফিকশান'।

লেখক : কথাসাহিত্যিক, সাবেক সিনিয়র সচিব